হিন্দু সংহতি

সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

দ্বিতীয় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, মার্চ ২০১০, কলকাতা ✿ মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

বিরাট সংখ্যক মানুষ মনে করেন যে, পাকিস্তান দুষ্টবুদ্ধিতে ভরপুর।পাকিস্তান সৃষ্টির উদ্দেশ্য দু'টি, একটি প্রাথমিক এবং অপরটি দূরবর্তী। প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে পাশ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি মুসলিম যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা। এবং পরবর্তী উদ্দেশ্য হচ্ছে হিন্দুস্থানকে আক্রমণ করে হিন্দুদের পুনর্জয় করা এবং শেষ পর্যন্ত ভারতকে মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করা।—ডঃ বি. আর. আম্বেদকর।

চকপরাণ কাঁটাখালিতে হোলির রঙ দেওয়া নিয়ে

পুলিশি অত্যাচার

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী হোলির দিন মগরাহাট থানার অন্তর্গত চকপরাণ কাঁটাখালিতে বাচ্চারা হোলির আনন্দে মেতেছিল। এলাকা দিয়ে চলে যাওয়া কোন গাড়ির ওপর রং দেওয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে, টহলরত পুলিশ ধেয়ে এসে ওই বাচ্চাদের প্রহার করে এবং রং-এর তিনটি বালতি দুমড়ে মুচড়ে দেয়। খবর পেয়ে অভিভাবকেরা প্রতিবাদ জানায়। স্থানীয় যুব নেতা উজ্জ্বল মণ্ডল এবং সংহতি কর্মী তারক সাঁপুই রুখে দাঁড়ালে, সকলে মিলে কিছুক্ষণ রাস্তা আটকে রাখে। খবর পেয়ে মগরাহাট থানার ওসি, সংশ্লিষ্ট সি আই বিশাল বাহিনী নিয়ে ছুটে আসেন। ওসি, সি.আই. করজোড়ে অভিযুক্ত পুলিশ কনস্টেবলের ভুল স্বীকার করে নেয়। জনৈক পুলিশ কর্মী হোলির উৎসবে মেতে উঠবেন এই ইচ্ছা প্রকাশ করে উর্দি খুলে রং মাখতে সম্মতি প্রকাশ করেন কিন্তু বিকাল পর্যন্ত ওই অভিযুক্ত পুলিশ কনস্টেবল কথামত নিজে এসে ভুল স্বীকার না করাতে, পরিস্থিতি উত্তাল হয়। প্রতিবাদে সংহতি কর্মীরা ওইদিন সন্ধ্যায় এক জোরালো প্রতিবাদ সভা করেন। ডায়মন্ডহারবারের বিশিষ্ট আইনজীবি তপন বিশ্বাস ও সংহতির রাজ্য সহ-সভাপতি উপানন্দ ব্রহ্মচারী ভাষণ দেন। হিন্দুদের উপর ছুতোনাতায় নিপীড়নের পুলিশি মানসিকতার তীব্র নিন্দা করে বলা হয়, অভিযুক্ত ক্ষমা না চাইলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে। এরপর মগরাহাট থানাতে ওই অভিযুক্ত কনস্টেবল তার ভুল স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন এবং ভবিষ্যতে এরকম ভুল হবে না বলে জানিয়েছেন।

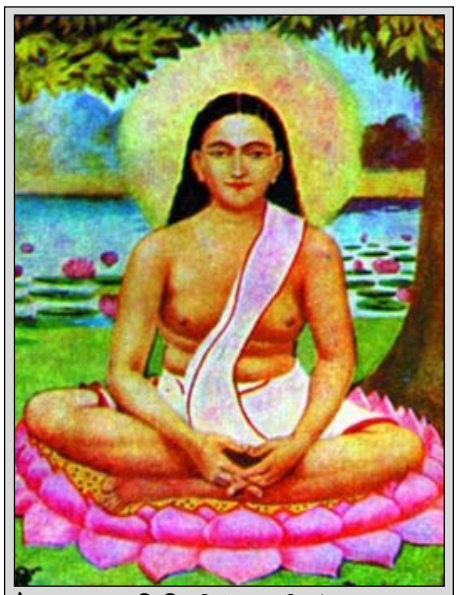

ঠাকুরনগরে শ্রীশ্রীহরিচাঁদ আবির্ভাব মহোৎসব

১৩ মার্চ ২০১০ উত্তর ২৪ পরগণার ঠাকুর নগরে হরিভক্ত মতুয়া মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ভারতের ও বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে লক্ষ লক্ষ ভক্তজন সম্মিলিত ভাবে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের আদর্শে সংঘবদ্ধ হবেন। বিগত বছরের মতো এবারও হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে তীর্থ যাত্রীদের সেবার জন্য জলসত্র ও পুস্তক বিক্রয়ের স্টল দেওয়া হবে। এই পবিত্র মহোৎসব উপলক্ষে আগত সমস্ত ভক্তবৃন্দগণকে হিন্দু সংহতির পক্ষথেকে 'স্বাগতম'।

হিন্দু সংহতির দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তিতে বিপুল উৎসাহে

বিশাল হিন্দু জনসভা

১৪ ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতির দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বর্ষ পূর্তিতে বিশাল হিন্দু সমাবেশ হয়ে গেল, শিয়ালদহর কাছে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। উৎসাহ, উদ্দীপনা আর জনসমাবেশ ছিল চোখে পড়ার মত। শুধু সমাবেশই নয়, দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তিতে হিন্দু সংহতি তার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও আদায় করতে সমর্থ হয়েছে। বিদেশে বসবাসকারী হিন্দুরা আশা করছে বাঙালী হিন্দুর স্বার্থ রক্ষা করবে বাংলার উদিত সূর্য 'হিন্দু সংহতি'। এই সভায় যারা মঞ্চাসিন ছিলেন তাদের উপস্থিতিই হিন্দু সংহতিকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছে দিয়েছে। একটি দুঃখের ঘটনা মাত্র পাঁচদিন আগে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষের মাতৃবিয়োগ। তবুও তিনি সবকিছু মাথায় নিয়েই এই কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

দুপুর ঠিক ১-৪৫ মিনিটে কাশ্মীরে বরফ চাপায় নিহত বীর জওয়ানদের, পুনাতে জেহাদী মামলায় নিহত ব্যক্তিবর্গের ও শ্রী তপন কুমার ঘোষের মাতৃদেবীর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ওঁ-কার ধ্বনির মাধ্যমে সভা শুরু হয়। দক্ষিণ ও উত্তর চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, হুগলীর কর্মীদের শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে ভারতমাতার জয়ধ্বনি দিতে দিতে মিছিল করে মাঠে আসা স্থানীয় মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। হাওড়া, মালদা ও কাটোয়ার কর্মীরা আসে হাওড়া দিয়ে। বাকি বিভিন্ন স্থান থেকে যাদের ট্রেনে যোগাযোগ নেই এমন স্থান থেকে ছোট, বড় ম্যাটাডোর, ট্রাক ও দুটি বাস সহ প্রায় একশোটি গাড়িতে করে কর্মীরা আসেন। সভায় বিভিন্ন স্থান থেকে মাতৃশক্তির

শেষাংশ তৃতীয় পাতায়

হিন্দু তীর্থ গঙ্গাসাগরে সম্পূর্ণ হিন্দু এলাকা রুদ্রনগর বাজারে

মসজিদ নির্মাণ নিয়ে মুসলিম তাণ্ডব

বিশেষ সংবাদদাতা, গঙ্গাসাগর, ২/২/২০১০- মুসলিম তাণ্ডবে আবার উত্তপ্ত হল গঙ্গাসাগর। ২০০৮ জুন মাসে হিন্দু সংহতি শিবিরে শেখ ইসমাইলের নেতৃত্বে আক্রমণ, সমস্ত রাজনৈতিক দলের মদতে গঙ্গাসাগরে নানা জায়গায় হিন্দু মন্দিরে চুরি-ছিনতাই, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উপর হেনস্থা, হিন্দু জমি দখলের অপচেষ্টা ধারাবাহিক ভাবে চলছে। এবার সম্পূর্ণ হিন্দু এলাকা রুদ্রনগরে মসজিদ ও মুসাফির খানা তৈরির দাবি তুলল ইসলামিক আগ্রাসনে বিশ্বাসী ধর্মান্ধ কিছু মুসলমান।

গত ১লা মার্চ রুদ্রনগর বাজার সংলগ্ন অহল্যা ক্লাবের মাঠে ৩০ বছরের পুরাতন দুর্গাপূজার স্থলেই মসজিদ করার জন্য একদল বহিরাগত মুসলমান এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু কমিটির নেতা আব্দুল কাহার ও সিপিএম সংখ্যালঘু সেলের নেতা জয়নাল আবেদিনের নেতৃত্বে সমবেত হয়। তারা বেলা ১০টা নাগাদ লোকজন সহ মাঠ ঘিরে ফেলে কংক্রিট পিলার ও কাঁটাতার সহযোগে বাঁশের বেড়া নির্মাণ শুরু করে দেয়। বিশাল ''রুদ্রনগর জামে মসজিদ ও মুসাফির খানা'' সংবলিত বোর্ড টাঙায়।

এই পরিস্থিতিতে এলাকার এবং বাজারের হিন্দু জনগণ তীব্র প্রতিবাদে ওই অনায্য বেড়া উপড়ে ফেলে ও দুষ্কৃতিদের তাড়িয়ে দেয়। এরপর পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি মোটামুটি শান্ত হয় এবং প্রশাসন কর্তৃক একটি সর্বদলীয় বৈঠকের কথাও ভাবা হয়। কিন্তু দুষ্কৃতি মুসলমানরা যে তলে তলে প্রস্তুত হচ্ছে তা আগে জানা যায়নি। ওইদিন রাত ১০-৩০ নাগাদ সাগরে বৈদ্যুতিক আলো নিভিয়ে দেওয়ার পর, সাগর উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ হতে ম্যাটাডোর, বাইক ও অন্যান্য গাড়িতে সহসা ৫০০/৬০০ জন মুসলমান রুদ্রনগর বাজারে হাজির হয়ে হিন্দু দোকান ভাঙচুর তথা অহল্যা ক্লাবটিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। মুসলিমদের মিছিল থেকে স্লোগান ওঠে 'অহল্যা ক্লাব সভাপতি শিবেন্দু মন্ডলের মুণ্ডু চাই'। হুমকি দেওয়া হয়, 'হিন্দু কেটে সাগরের জল লাল করে দেওয়া হবে।' হিন্দুরাও সাধ্যমত বাধাদান করে। পরে রুদ্রনগরে ১৪৪ ধারা ও পুলিশ পোস্টিং হয়। পুলিশ দুটি মামলা কেস ২০৬/১০ ও ২০৭/১০ চালু করে। আশ্চর্যের বিষয় পুলিশ মুসলমানদের অভিযোগে ৭ জন নির্দোষ হিন্দুকে গ্রেপ্তার করেছে। আর আক্রমণকারী ৫ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করে। বিষয়টি নিয়ে গঙ্গাসাগরে উত্তেজনা রয়েছে। সম্পূর্ণ মুসলমানবিহীন রুদ্রনগরে মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে হিন্দু এলাকায় মুসলমানের জোর খাটানোর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হচ্ছেন। হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে সুজিত মাইতি ও উপানন্দ ব্রহ্মচারী ঘটনাস্থল পরিদর্শণ করে স্থানীয় হিন্দু নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেন।

আমাদের কথা

মুসলিম মেয়েকে ভালোবেসে বিয়ের পরিণাম

ভালোবাসার আবার জাত হয় নাকি? এটা বাঙালি বুদ্ধি বিক্রি করে খাওয়া সম্প্রদায়ের কাছে একটা বড় প্রশ্ন। কিন্তু হয়, জাত হয়। যখন আমরা দেখি প্রিয়াঙ্কাকে না পাওয়ার ফলে রিজওয়ানুর আত্মহত্যা করলে তার দুঃখে সকল মিডিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেটা লিডিং নিউজ হয়। চারজন প্রথম সারির প্রশাসনিক কর্তার শাস্তি হয়। মেয়ের বাবাকে পর্যন্ত জেল খাটতে হয়। এমনকি লাক্স কোজির সঙ্গে শাহরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যবসায়িক চুক্তি ভঙ্গ হয়।

অপরদিকে যদি ঐ মুসলিম সম্প্রদায়ের কোন মেয়েকে ভালোবেসে কোন অমুসলিম ছেলে বিবাহ করে তবে তারজন্য দুটি রাস্তা খোলা থাকে, এক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত অন্যথা কোতল। এরকমই বাস্তব দৃষ্টান্ত। কিন্তু এরকম ঘটনা ঘটলে কোন বুদ্ধি বিক্রিওয়ালার বুদ্ধি কাজ করে না। কোন মিডিয়ার প্রধান নিউজ হয় না বা কোন মানবাধিকার সংগঠনের মানবীয় মনকে নাড়া দেয় না।

মৌলবীদের নৃশংস আক্রমণে খুন হয়েছিল ছেলের বাবা। শান্তিপুরের সুত্রাগড়ের সেনপাড়ার রাধানাথ সাধুখাঁর ছেলে চঞ্চল সাধুখাঁ বিয়ে করেছিল লিয়াকত আলি শাহর মেয়ে মামণিকে। দীর্ঘদিন ধরে প্রণায়াসক্ত থাকার পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। তাদের একটি পুত্র সন্তানও হয়। লিয়াকত আলি মেনে নেয়নি এই বিবাহ। ডাকাতির নামে লোক পাঠিয়ে মেয়েকে জোর করে রাত্রে তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ৭৫ বছরের বাবা রাধানাথ সাধুখাঁ পুত্রবধূকে নিয়ে যেতে বাধা দেন। ফল ১৩ অক্টোবর মহাসপ্তমীর রাত্রে ২০০২ সালে খুন হন রাধানাথ বাবু। বিষয়টা নিয়ে মামলা চলছে। নিষ্পত্তির আগেই দ্বিতীয় প্রস্তাব আসে চঞ্চলকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হবার জন্য।

সদ্য আর একটি ঘটনা ঘটে মেদিনীপুর দাঁতনের তিন নম্বর মনোহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বেজদা গ্রামে। সেই গ্রামের এক যুবক সন্তু রাউৎ একটি মোবাইল টাওয়ার কোম্পানির কাজ নিয়ে সুদূর বসিরহাটে কর্মরত ছিলেন। ফোনেরই রং নম্বরের মাধমে তার প্রথম যোগাযোগ হয় মনসুর মোল্লার মেয়ে হালিমা খাতুনের সঙ্গে। শুরু হয় প্রেমপর্ব, এমন পর্বে পৌঁছায় মাস পাঁচেক আগে হালিমা নিজেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। মাস খানেক আগে টেলিফোনে শ্বশুর মনসুরবাবুর সঙ্গেও যোগাযোগ হয়। মেয়ে জামাইয়ের বাড়িতে এসে মেয়ে জামাইকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন মনসুর। কিন্তু মেয়ে যেতে রাজি হয়নি। মনসুর মেয়ের বাড়ীতে তিনচার দিন কাটিয়ে বাড়ি ফিরে যান।

২২শে ফেব্রুয়ারী 'প্রতিদিন'এর খবরে প্রকাশ— সন্তুর বয়ান অনুযায়ী হঠাৎ একটি আওয়াজে ঘুম ভাঙতেই দেখি দু'জন লোক মুখে কালো কাপড় বেঁধে তাদের ঘরের ভিতর ঢুকছে। কোন বাধা মানেনি তারা। সকলকে মারতে থাকে, মা ও স্ত্রীর গলা টিপে ধরে। সন্তু একজনকে ধরে পিছন দরজা দিয়ে বাইরে বের করে চিৎকার করতে থাকে। ওরা তখন তার স্ত্রীকে নিয়ে পালাতে থাকে। এদিকে লোকজড়ো হতে থাকলে ছেড়ে পালাবার সময় তাদেরই বোমা ফেটে একজনের মৃত্যু হয়। একজনের হাত ও একজনের পা উড়ে যায়। গ্রামবাসীরা আহতদের ধরে ফলে। বাকিরা পালায়। তাদের মাধ্যমেই মূল পাণ্ডা আমির আলিকে ডাকানো হয়। সে আসলে তাকেও গণধোলাই দেওয়া হয়।

বিহারের শৈলেন্দ্র প্রসাদ বহরমপুর থানার লক্ষ্মণপুর গ্রামের মেয়ে মানেরাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল মুম্বইতে। তাদের এক পুত্রসন্তানও হয়। শৈলেন্দ্র মানেরার বাপের বাড়িতে আসে। শৈলেন্দ্রর মনে ভয় ছিল, তাই নাম পরিবর্তন করে মুন্না শেখ বলে পরিচয় দেয়। মানেরার বাবা আনসারিয়া শেখের সন্দেহক্রমে ১৪ই জুলাই '০৭ লক্ষ্মণপুর গ্রামের জুনিয়র বেসিক স্কুলে সালিশী সভা বসে। সেই সভায় মাতব্বর গাজু শেখ, সাত্তার শেখ ও খায়রুল শেখরা শৈলেন্দ্রর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে। তৎক্ষণাৎ শৈলেন্দ্রকে কোতল করে তার ধড় থেকে মুণ্ডুচ্ছেদ করে পাট খেতে পুঁতে দেয়।

বারাসতের চৌধুরী পাড়ার বাসিন্দা অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল বাদুড়িয়া স্কুল শিক্ষক নজরুল ইসলামের কন্যা রেহেনা সুলতানা। তাদের এক পুত্র সন্তানও হয়। কিন্তু ভিন্ন ধর্মের এই বিবাহকে মানতে নারাজ মুসলিম সমাজ। রেহনাকে তার পুত্র সন্তান নিয়ে জোর করে বাপের বাড়ি নিয়ে যায় রেহেনার দাদা। অর্ক তাকে ফিরিয়ে আনতে গেলে অর্ককে গাছে বেঁধে রেহেনার দাদা মণিরুল তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। যদিও অর্ক এখনও বেঁচে আছে স্রেফ ভাগ্যের জোরে। কিন্তু তার গোটা শরীর পুড়ে বিকৃত। এইরকম অসংখ্য ঘটনার খবর মানুষ জানতে পারে না, কারণ মিডিয়াতে তা প্রচার পায় না। সেকুলারিজমের এটাই নীতি। হিন্দু ও মুসলমানের জন্য দুরকমের আচরণ। তাই আজ সময় হয়েছে একথা বলার— **"আমি নিজেকে সেকুলার বলিতে লজ্জা অনুভব করি।"**

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় হাজার হাজার বছর ধরে এই দেশে থেকেও মুসলিম সমাজের কোন মেয়েকে ভালোবেসে বিবাহের পরিণাম যদি এরকম আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয়, তাহলে কি এক জাতি এক প্রাণ বা হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই হবে? ভালোবাসলে যদি কোন ধর্ম আগুন লাগিয়ে দেয় বা মুণ্ডুচ্ছেদ করে, আর যাই হোক সেটা ধর্ম হতে পারে কি? তাহলে হিন্দু মেয়েকে মুসলমান বিয়ে করলে, হিন্দুরা তা মেনে নেবে কেন?

"মাই নেম ইজ খান" খ্যাত শাহরুখ খানও এর উত্তর বোধকরি দিতে পারবেন না। তারা টিপু সুলতান মসজিদের ইমামের হুমকিতে 'নাইট রাইডার্সের' সাথে 'লাক্স কোজি'র চুক্তি খারিজ করতে পারেন। এরা মুসলিম মৌলবাদের চাপে ভারত বিরোধীতা করলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বাঙালি হিন্দুদের প্রতি

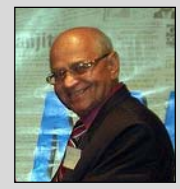

নিউইয়র্ক, আমেরিকা থেকে নারায়ণ কাটারিয়া

আমার প্রিয় হিন্দু ভাই ও বোনেরা—সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

আমেরিকাবাসী হিন্দু এবং ইন্ডিয়ান-আমেরিকান ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালস্ ফোরামের পক্ষ থেকে এই ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১০ সালে 'হিন্দু সংহতি'র দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তিতে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। হিন্দু সমাজের মধ্যে সার্থকভাবে এই দুই বৎসরের কাজকে আমরা অভিনন্দিত করি। 'হিন্দু সংহতি' এই অল্প সময়েই বাংলার হিন্দুদের মধ্যে এক নূতন ধরণের আস্থাবোধ ও গর্বের সঞ্চার করেছে। এখন বাংলার হিন্দুরা তাঁদের নিজেদের বিশ্বাস ও শক্তির বিচার শুরু করেছেন।

বাংলার হিন্দু সমাজের মধ্যে একতা ও সহমর্মিতা বোধের জাগরণে আমরা আমেরিকা থেকে আপনাদের অভিনন্দন জানাই।

আপনারা জানেন যে, আমরা ভারতের মহান ঋষি-মুনিদের মহান সংস্কৃতির উত্তরসূরী। আমাদের হিন্দুধর্ম সকল ধর্মমতের মাতৃস্বরূপা। এই ধর্মের মধ্যে কোনও গোঁড়ামি নেই, আর সেইজন্যই সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে নিজেদের মধ্যে আচার-সংহিতার পরিবর্তন নিজেরাই করে নিই। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যখনই ধর্ম হ্রাস পেয়েছে এবং অধার্মিক শক্তি মাথাচাড়া দিয়েছে তখনই ধর্ম নিজেই নিজেকে সংগঠিত করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অধর্ম শক্তিকে পদানত করে ধর্মশক্তির বিজয় বৈজয়ন্তীর প্রতিষ্ঠা করতে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইসলামী শাসনে যখন হিন্দুদের নাভিশ্বাস উঠেছিল, কোথাও কোনও আশার কিরণ দেখা যাচ্ছিল না, তখন মহারাষ্ট্রে উদিত হলেন ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ—মহান হিন্দু যোদ্ধা। ভারতবর্ষ থেকে ইসলামী ক্রূরতা এবং তার প্রবল প্রতাপ তিনি খর্ব করলেন। দিল্লীর মুসলিম শাসকেরা যখন শিখ গুরু তেগবাহাদুরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করলেন তখন তাঁর পুত্র গুরু গোবিন্দ সিংহ হিন্দুদেরকে ঢেলে সাজালেন 'খালসা' রূপে। তাঁদের নব বলে বলীয়ান করে গড়ে তুললেন এক মানব-যোদ্ধাদের প্রাচীর। ভারতের সমগ্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে এই শিখ সেনারা আক্রমণকারী ইসলামী শক্তিকে পর্যদুস্ত করে তাদের আফগানিস্তান পর্যন্ত খেদিয়ে দিলেন, রক্ষা পেল হিন্দুধর্ম।

এই সেদিনও বাংলার হিন্দু সংগ্রামীরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এক সময়ে সারা ভারত তাকিয়ে ছিল বাংলার থেকে উৎসাহ ও দিশা-নির্দেশ পেতে। বাংলা জন্ম দিয়েছে বহু বহু নেতা-মনীষীর। বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন ছিলেন ঋষি অরবিন্দ। তিনি একাধারে স্বাধীনতা সংগ্রামী, কবি, বিশাল পণ্ডিত, যোগী এবং দার্শনিক।

শ্রী অরবিন্দের পূর্বে এসেছিলেন ত্যাগ, নিষ্ঠা ও নির্ভীকতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি স্বামী বিবেকানন্দ। শত বৎসর পূর্বে তাঁর দৃঢ়, কম্বুকণ্ঠের আহ্বান আজও লক্ষ লক্ষ হিন্দুর অন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে। হিন্দুজাতি গঠনে অনুরণিত হচ্ছে তাঁর বাণী ঃ

'তোমরা কি তোমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে অনুভব করছো তোমাদের সাথী ভাই-বোনেদের দুঃখ-কষ্ট, তাদের বেদনা? যদি তা বুঝতে পার, তাহলে তাদের জন্য কিছু করছো না কেন? এই মুহূর্তেই সক্রিয় হও, তাদের সেবার জন্য নিজেদের বিলিয়ে দাও।'

'আর নিদ্রা যাওয়ার সময় নেই। আমাদের কাজের উপর নির্ভর করছে আগামীদিনের ভারত। ওঠ, জাগো। যতক্ষণ না লক্ষ্যে পৌঁছাচ্ছ থেমো না।'

আর এই সেদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক ভীষণ যুদ্ধে নেমেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস। গড়ে ছিলেন তাঁর সেনাবাহিনী—আজাদ হিন্দ ফৌজ। তাঁর বিখ্যাত আহ্বান ছিল—'আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।'

দুর্ভাগ্যবশতঃ এই মুহূর্তে ভারতে হিন্দুরা দেখছেন তাঁরা নেতা শূন্য, হাল শূন্য। তাঁরা চান সাহসী নেতৃত্ব এবং এক্ষুণি কাজে নেমে পড়া। স্বভাবতই তাঁরা চেয়ে আছেন বাংলার দিকে। আমরা আমেরিকা থেকে কি আশা করতে পারি যে, বাংলার 'হিন্দু সংহতি' সামনে এগিয়ে এসে দেশবাসীর আকাঙ্খাকে পূর্ণ করবে?

বর্তমানে হিন্দুরা ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। আবার তাঁরা আক্রান্ত। এবারের আক্রমণ ভিতর ও বাহির—উভয় দিক থেকে। তাঁদের উপর এসে পড়েছে এক অঘোষিত যুদ্ধ। হিন্দুদের খুঁজে খুঁজে চিহ্নিত করতে হবে তার শত্রুদের, আর তাদের মোকাবিলার জন্য উপযুক্ত পন্থা বার করতে হবে। একাজে প্রতিটি হিন্দুকে কাজ করতে হবে অন্য সমস্ত হিন্দু গোষ্ঠীর সঙ্গে, যাঁরা ঐ একই উদ্দেশ্যে কর্মরত।

হিন্দুরা তাদের নিজেদের দেশেই সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর দ্বারা শাসিত, নিয়ন্ত্রিত এবং হাতের পুতুলে পরিণত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে ৫০ লাখ বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশ তাদের শান্তি ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে গোদের উপর বিষ ফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে হিন্দুদের নিকট একমাত্র কার্যকর পন্থা সামনে এসেছে, তাহল—রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজেদের দখলে আনা। চাই দেশের মধ্যে হিন্দুনিষ্ঠ সরকার। ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগ হিন্দু। অবশ্যই তাদের ভোটাধিকারের সঠিক প্রয়োগ করতে হবে।

হিন্দু ঐক্য ও সংহতির জন্য 'হিন্দু সংহতি' যে সাহসিক কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছে তারজন্য পুনরায় আমরা ধন্যবাদ জানাই। অভিনন্দিত করি আপনাদের তীব্র ইচ্ছাশক্তি, আপনাদের কর্তব্য নিষ্ঠা এবং সাহসের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়াকে। ভারতের হিন্দুদের স্বাধীনতার জন্য রাষ্ট্রশক্তির উপর অধিকার। রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের মাধ্যমেই হিন্দু স্বাধীনতা লাভ করা যাবে।

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ, গুরু গোবিন্দ সিং, সুভাষচন্দ্র বোস এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী যেভাবে আমাদের পুণ্যভূমি ভারতের হিন্দুদের স্বাধীনতার জন্য যে পথ প্রদর্শন করে গেছেন, সেই পদাঙ্কানুসরণ করতে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনারা দৃঢ়ভাবে জেনে রাখুন, আপনাদের এই ঐতিহাসিক সংগ্রামে আপনারা একা নন। আমরা, আমেরিকাবাসী হিন্দুরা, বাঙালি হিন্দুদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে প্রস্তুত। ভারতে পুনরায় বাংলার হিন্দুরা প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে নেমেছেন। আমরা আমেরিকাবাসী হিন্দুরাও আপনাদের সমর্থনে এগিয়ে আসব।

জয় হিন্দ। বন্দে মাতরম্।।

নারায়ণ কাটারিয়া
সভাপতি
ইন্ডিয়ান-আমেরিকান ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালস্ ফোরাম, নিউইয়র্ক

মগরাহাট কলেজে সরস্বতী পূজায় নিষেধাজ্ঞা

গত ২০শে জানুয়ারী ২০১০ তারিখে, মগরাহাট কলেজে সরস্বতী পূজা হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ আগে থেকে নোটিশ টাঙিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। কলেজের হিন্দু ছাত্ররা সেই নিষেধাজ্ঞা না মেনে সাইকেল গ্যারেজে সরস্বতী পূজা করে।

এতে কলেজের দুজন স্টাফ—বাসার (কলেজের গার্ড), অপরজন অনসার আলি (লাইব্রেরীয়ান) পূজার উদ্যোক্তা ছাত্রদের নাম, রোল নাম্বার, ক্লাস টুকে নেয়। কলেজের প্রফেসার ইন-চার্জ মন্দিরা সরকার (মুসলমানদের চাপে পড়ে) পূজা না করার জন্য পূজা উদ্যোক্তাদের ফোনে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুকুম জারি করেন। এর আগে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ বাসুদেব বর্মন ও বর্তমান মগরাহাট ২-এর বিধায়ক বাঁশরী মোহন কাঞ্জী কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিটিং করে মগরাহাট কলেজে পূজা করার বিষয়ে ঘোর আপত্তি জানান। সেই সময় থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে মগরাহাট কলেজে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হবে না। তা সত্ত্বেও মগরাহাট কলেজের হিন্দু ছাত্ররা বিদ্যাস্থানে সরস্বতী পূজার জন্য কঠিন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ঠাকুর যেদিন তোলা হয়, সেইদিন রাত্রেই পুলিশের চাপে স্থানীয় হিন্দুদের পুকুরে প্রতিমা বিসর্জন করা হয়।

২৫-৩০ জন হিন্দু ছাত্র মিলিতভাবে সারা দিন নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক পর্যালোচনা করে। পূজা না করতে বলে পুরোহিতকে আগের দিন মুসলমানরা ধমকি দেয়।

প্রতিবেদন—তুলসী দাস গায়েন

এই সর্বনাশা ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ বন্ধ কর

তপন কুমার ঘোষ

এ জিনিস মেনে নেওয়া যায় না। এই সর্বনাশ আমরা বাংলার হিন্দু যুবকরা মেনে নিতে পারি না। রাজনৈতিক দলগুলো আর তাদের নেতানেত্রীরা শুধু ভোটের লোভে, শুধু ক্ষমতার লোভে এই সর্বনাশা খেলায় মেতেছেন। ভবিষ্যতের সর্বনাশ নিয়ে তাঁদের একটুও চিন্তা নেই। যেন তেন প্রকারেণ তাঁদের শুধু পশ্চিমবঙ্গের ৩০ শতাংশ মুসলিম ভোট চাই। এই মুসলিম ভোটকে বাদ দিয়ে আজ আর রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ক্ষমতা দখল করার কথা ভাবা যায় না। রাজনৈতিক দলগুলোর এই দুর্বলতার কথা মুসলমানরা খুব ভালভাবেই বুঝে গেছে। তাই তারা এর মূল্য আদায় করে নিচ্ছে পুরোপুরি।

সেই মূল্যের **প্রথম কিস্তি**—ওদের জন্য বিপুল আর্থিক অনুদান। আগ্রহী পাঠক যে কোন স্কুল কলেজে এবং হোস্টেলে খোঁজ নিয়ে দেখবেন দেশের মানুষের কষ্টার্জিত টাকা কিভাবে সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের নামে মুসলমানদের জন্য বন্যার জলের মত বইয়ে দেওয়া হচ্ছে। **দ্বিতীয় কিস্তি**—ইসলামিক ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা চালানোর জন্য আমাদের হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ। একথা অনেকেই জানেন না যে মাদ্রাসা মুসলিমদের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। যে কোন ইসলামিক শব্দকোষ থেকে দেখে নিন, মাদ্রাসা হল মৌলানা, ইমাম্ ও মুফ্‌তি তৈরির প্রতিষ্ঠান। কেউ একথা প্রশ্ন করে না যে, ওদের ইমাম বা মৌলানা তৈরি করতে আমরা পয়সা দেব কেন? পুরোহিত, খ্রীষ্টীয় যাজক, রাব্বি (ইহুদী পুরোহিত), বা ভন্তে (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী পুরোহিত) তৈরি করতে তো সরকার টাকা খরচ করে না! তাহলে ইমাম-মৌলানা তৈরি করতে কেন টাকা খরচ করবে?

তৃতীয় কিস্তি—একের পর এক মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শাখা কোথাও হবে না। কিন্তু আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি শাখা/ক্যাম্পাসের অনুমোদন, জমি ও টাকা দেওয়া ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে মুর্শিদাবাদ, কিষণগঞ্জ ও কর্ণাটকে। আরও কত জায়গায় দেওয়া হবে কে জানে!

এরকম কিস্তির হিসাব করে শেষ করা যাবে না। হজ করতে প্রতি মুসলমান ২২ হাজার টাকা ভর্তুকি—এসব তো পুরানো কিস্তি। এখন নতুন কিস্তি হল ওদের জন্য সবকিছুতে সংরক্ষণ। শিক্ষায় সংরক্ষণ, চাকরিতে সংরক্ষণ, আবাসনে সংরক্ষণ। কেন ওদের জন্য সবকিছুতে সংরক্ষণ করতে হবে? ওরা কি খুব কষ্টে আছে? ওদের জনসংখ্যা কি কমে যাচ্ছে? ওরা কি লোপ পেয়ে যাচ্ছে? '৪৭ সালে ওরা ওদের ভাগের জমি ও সম্পত্তি আলাদা করে নেওয়ার পরেও এই পশ্চিমবঙ্গে ওরা ১৯ শতাংশ ছিল। আর হিন্দুরা ছিল ৮১ শতাংশ। এই ৬৩ বছরে ওরা পশ্চিমবঙ্গে ১৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৯ শতাংশ হয়েছে। আর হিন্দুরা ৮১ শতাংশ থেকে হয়েছে ৭১ শতাংশ। তাহলে কারা ভাল আছে আর কারা খারাপ আছে? কাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠছে দিন দিন? ওরা কি লোপ পেয়ে যাচ্ছে বাঘ বা কচ্ছপের মত? যে ওদের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে? ৬৩ বছরে যাদের জনসংখ্যা ১০-১১ শতাংশ বেড়ে গেল—তারা খারাপ আছে? কষ্টে আছে? পার্ক সার্কাসে, মেটিয়াবুরুজে, এমনকি কলকাতার বড়বাজারে যে হিন্দুদের বাড়িগুলো বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, সেগুলো কারা কিনছে? চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-র উপরে মহাজাতি সদনের পাশে অতবড় প্রাইম ল্যান্ডটা কোন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী কিনতে পারল না। কিনল সোহরাব! ওরা খারাপ আছে? পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় রেজিস্ট্রি অফিসগুলোতে যত জমি বিক্রয় হয়, তারমধ্যে ৯০ শতাংশ বিক্রেতা হিন্দু, ক্রেতা মুসলমান। অন্যান্য জেলাগুলোতেও প্রায় একই চিত্র। তাহলে ওরা খারাপ আছে, কষ্টে আছে? হাওড়ার মঙ্গলাহাটের জৌলুষ কেড়ে নিয়েছে মেটিয়াবুরুজের আক্রা রোডের জব্বার হাট। মঙ্গলাহাট বসে মঙ্গলবার। মেটিয়াবুরুজের হাট দুদিনের-শনি ও রবিবার। ঐ এলাকায় ১০-১২টি পাকা স্থায়ী হাটগুলোতে অন্তত ২৫ হাজার দোকান বসে। সমস্তই মুসলমানের দোকান। মঙ্গলাহাট ও হাতিবাগানের হরিশা হাট মার খেয়ে গিয়েছে। ওরা খারাপ আছে?

বিগত ১৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গে যতগুলি ঝাঁ-চকচকে বিশাল প্রাসাদোপম নতুন মসজিদ তৈরি হয়েছে, যতগুলি মসজিদের তলা বেড়েছে, যতগুলি মসজিদের ঝাঁ চকচকে রেনোভেশন হয়েছে, তা দেখে মনে হয় ওরা খারাপ আছে? বিগত ২০ বছরে ৫০০-অধিক ছাত্র থাকতে পারে এরকম কয়েক ডজন আবাসিক মাদ্রাসা তৈরি হয়েছে, এবং তার থেকে ছোট আবাসিক মাদ্রাসা তৈরি হয়েছে ১০০-এরও বেশি। এইসব মাদ্রাসার ছাত্ররা যখন দলবেঁধে টুপি পরে গ্রাম ও আধা শহরের রাস্তাগুলোত ঘুরে বেড়ায়, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের ল্যাণ্ডস্কেপটাই যার দ্বারা পাল্টে গেছে—তা দেখে মনে হয় ওরা খারাপ আছে, কষ্টে আছে? তুলনায় আমাদের এস.সি, এস.টি. এলাকাগুলো কি খুব উন্নত হয়ে গেছে? মহাশ্বেতা দেবী, শাঁওলি মিত্ররা কি বলেন? ওদের জন্য কি বিশেষ ব্যবস্থা করা হচ্ছে?

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের জন্য চাকরিতে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়া হবে—ঘোষণা করেছে সিপিএম এবং বামফ্রন্ট সরকার। ফরোয়ার্ড ব্লক ও অন্য শরিকরা দু'হাত তুলে সমর্থন করেছে। কংগ্রেস-তৃণমূলও সমর্থক। কেন? কেন এই বেআইনি কাজকে সমর্থন? আমাদের সংবিধানে কি স্পষ্ট করে লিখে দেওয়া নেই যে ধর্মের ভিত্তিতে কাউকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া যাবে না, ধর্মের কারণে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। তাহলে এই সংবিধান বিরোধী ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ কেন? ধর্ম ধর্ম আলাদা করা, কোন বিশেষ ধর্মকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া—এটাই কি ধর্মনিরপেক্ষতা? তাহলে ভোট ভিক্ষুকরা—তোমরা সংবিধান পরিবর্তন কর। অন্ধ্রপ্রদেশে মাত্র ৪ শতাংশ চাকরিতে সংরক্ষণ মুসলমানদের জন্য করেছিল রাজ্য সরকার। অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট সেটাকে সংবিধান বিরোধী বলে খারিজ করে দিল। এই রায়ের পরেও পশ্চিমবঙ্গে কেন এই ১০ শতাংশ ধর্মীয় সংরক্ষণ ঘোষণা করা হল?

সবথেকে বড় কথা—এটা হল তোষণ। এই তোষণ গান্ধী-নেহেরুরা কম করেছিলেন? তারই পরিণাম কি দেশভাগ হয়নি? তোষণ করে কখনো কোন অন্যায় দাবীকারীকে শান্ত করা যায়? তুষ্ট করা যায়? শুধু গান্ধী নেহেরুই দোষী ছিলেন না। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে তিলক এবং ১৯২৩ সালে বেঙ্গল প্যাক্টে চিত্তরঞ্জন দাশও ওদেরকে সংরক্ষণ দিয়ে তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। এসবের পরিণাম কি হয়েছে? তাই আজ একথা স্পষ্ট করে বোঝার প্রয়োজন এসেছে যে, তোমরা তো ভোটের লোভে ওদের অন্যায় অবৈধ অসাংবিধানিক দাবীর কাছে মাথা নত করে কুর্ণিশ করে ইফ্‌তার খেয়ে ফেজ টুপি পরে ওদের পদলেহন করছ! কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা, ভূগোলের অধ্যয়ণ ও পারিপার্শ্বিকের বাস্তব জ্ঞান এই অমোঘ সত্যকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, ওরা এখন চাইছে চাকরিতে সংরক্ষণ, চাইতেই পেয়ে যাচ্ছে। এরপর চাইবে ভূমির সংরক্ষণ। কারণ ওদের ধর্মশাস্ত্র ওদেরকে নির্দেশ দিয়েছে দুনিয়াটাকে দারুল ইসলাম করা। সেই নির্দেশ মেনেই গান্ধার হয়েছে আফগানিস্তান, সিন্ধ হয়েছে পাকিস্তান, ঢাকা হয়েছে ইসলামিক বাংলাদেশ। এরপর আসাম, পশ্চিমবঙ্গে আর পূর্ণিয়া কিষণগঞ্জ কাটিহার আরারিয়াকে নিয়ে হবে বৃহত্তর বাংলাদেশ। তারই লক্ষণ আসামে ৭টি জেলা, পশ্চিমবঙ্গে ৩টি জেলা, বিহারে ৩টি জেলা, পশ্চিমবঙ্গে ৬২ টি ব্লকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাওয়া।

সেই ভূমির ভাগ চাওয়ার আগের ধাপ চাকরিতে সংরক্ষণ চাওয়া। পণ্ডিতদের অনেক দিব্যজ্ঞান আছে, কিন্তু এইটুকু কাণ্ডজ্ঞান না থাকলে—সাবধান! সাবধান! আর সময় নেই। দাঁত দিয়ে মাটি কামড়ে লড়াই করতে হবে। হিন্দু যুবকের ভাত তো মারছেই। এরপর মাটিও কাড়বে। কিন্তু না। আর আমরা রিফিউজি হব না। এই অবৈধ তোষণকারী সর্বনাশা ধর্মীয় সংরক্ষণ মানি না, মানব না।

প্রথম পাতার শেষাংশ

বিশাল হিন্দু জনসভা.....

উপস্থিতি সভাকে পূর্ণতা এনে দিয়েছে। হুগলী থেকে কিছু কর্মী নিজস্ব বাইক নিয়েও আসে। রবিবার ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও তাদের পুলিশ থামিয়ে দেয় কারণ ততক্ষণে মাঠ উপচে ভিড় রাস্তায় এসে পড়েছে। সভায় আসা কর্মীরা মাঠে ঢুকতে না পেরে রাস্তায় বসে পড়ে। কিন্তু রাস্তায় বসাটা আইনের চোখে বেআইনি বলে পুলিশের সঙ্গে কিছুটা গরমাগরমী হলে তারা সকলেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে। অগত্যা পুলিশ আমর্হাস্ট স্ট্রীট আটকে দিতে বাধ্য হয়।

বাংলার আর্ত হিন্দুদের আপনজন তথা এই সভার প্রধান বক্তা স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী (ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ) ভারতমাতা ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও দীপ প্রজ্জ্বলন করেন। সভায় উপস্থিত হতে পারেননি কিন্তু তিনি তার লিখিত বক্তব্য পাঠিয়েছেন, শ্রী নারায়ণ কাটারিয়া—সভাপতি, ইন্ডিয়ান আমেরিকান ইন্‌টেলেকেচুয়ালস্ ফোরাম, নিউইয়র্ক। সভায় ছিলেন ডঃ বাবু সুশিলন, নিউইয়র্ক ইউনাইটেড হিন্দু ফ্রন্টের অন্যতম কর্ণধার। তিনি তার সংক্ষিপ্ত ভাষণটি ইংরেজীতেই রাখেন। ভাষণের সম্পূর্ণ অংশটি বাংলায় রূপান্তর করে শোনান শ্রী তপন কুমার ঘোষ। আগত সকল বিশিষ্ট বক্তাদের স্বাগত জানান সংহতির সহ সভাপতি শ্রী অমল কুমার বসু। ফিজির ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী সংযুক্তানন্দজীও এই সভায় উপস্থিত থেকে তিনি তার আশীর্বাদ প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিদেশে থাকলেও মনটা সবসময়ই দেশের জন্য টানে অর্থাৎ দেশের হিন্দুরা কেমন আছে জানতে ইচ্ছে হয়। আজকের এই বিশাল হিন্দু সমাবেশ দেখে ভালোই লাগছে আরো ভালো লাগছে। বাংলার এত হাজার হাজার যুবকরা এই সভায় উপস্থিত হয়েছে দেখে। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বামী উত্তমানন্দ মহারাজ, সনাতন ধর্মপ্রচার আশ্রম। স্বামী তেজসানন্দ, বর্ধমান তপেশ্বরী কালিকা আশ্রম। শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী, কলকাতা প্রভু জগৎবন্ধু আশ্রম। স্বামী পুণ্যলোকানন্দ, বগুলা রামকৃষ্ণ আশ্রম। মানবসেবা মিশনের সুনীল ব্রহ্মচারী। ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকেও বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা এই সভায় উপস্থিত থেকে সংহতি তথা হিন্দু যুবকদের উৎসাহ প্রদান করেন। তারা হলেন, দিল্লির হিন্দুস্থান নির্মাণ দলের শৈলেন্দ্র জৈন। সুনীল দেওধর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মঞ্চ, মুম্বই। বিনোদ যাদব, গো-রক্ষা আন্দোলন, বিহার। মধুসূদন শাস্ত্রী ও আনন্দ আর্য্য, আর্য্য প্রতিনিধি সভা, পঃ বঙ্গ। সভার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু শ্রী প্রমোদ মুতালিক, সভাপতি, শ্রীরাম সেনা, কর্ণাটক। তিনি তার ভাষণে হিন্দুদের শাস্ত্র এবং শস্ত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। হিন্দুদের শক্তিশালী সমাজ গঠনের জন্য ঘরে ঘরে শস্ত্রপূজার আহ্বান জানান। আগামী দিনে আবার রামমন্দির নির্মাণের জন্য অযোধ্যা অভিযানের আহ্বান জানান।

প্রধান বক্তা পূজ্য স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ (কার্ত্তিক মহারাজ) তাঁর উদ্দীপ্ত ভাষণের মাধ্যমে হিন্দু সংহতি ও হিন্দু যুবকদের আশীর্বাদ প্রদান করেন। একটি উদাহরণের মাধ্যমে তাঁর ভাষণের মর্মবাণী প্রকাশ করা যায়। ১৯৪৬ সালের নোয়াখালি ও কলকাতার হিন্দু গণহত্যার পর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য প্রণবানন্দজী মহারাজ বালিগঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আশ্রমে ডেকে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে একটি রুদ্রাক্ষের মালা দিয়ে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, বাংলাকে রক্ষা করতে। ১৪ ফেব্রুয়ারী শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ভরা মাঠে বাংলার বর্তমান গ্রামেগঞ্জে ইসলামি আগ্রাসন তথা চাকরিতে ১০ শতাংশ মুসলিম সংরক্ষণের মাধ্যমে যেভাবে পশ্চিমবঙ্গকে দ্বিতীয় বাংলাদেশে রূপান্তরের পথে ঠেলে দিচ্ছে সেখান থেকে বাংলাকে বাঁচাতে হিন্দু সংহতির নেতৃত্বকে শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এই কাজে স্বামীজীর আশীর্বাদ সর্বদা থাকবে। শুধু তাই নয় গ্রামেগঞ্জে মেয়েরা যেভাবে বিধর্মী দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছে তার হাত থেকে বাঁচার জন্য সাহসী এবং ঝাঁসির রাণীর মত লড়াকু হতে উপদেশ দেন।

সর্বশেষ সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ কয়েকটি সংকল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। চাকরিতে ধর্মের নামে সংরক্ষণ করা চলবে না। দিকে দিকে বাংলার মাটিকে শত্রুর দখল হতে দেওয়া যাবে না। হিন্দু ধর্ম, নারীর মান মর্যাদা, সম্পত্তি ও ধর্মস্থানের অধিকার রক্ষা করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গকে নতুন পাকিস্তানের পটভূমি হতে দেওয়া যাবে না। এক আরবীয় চক্রের চাপে অসহায় গ্রামের হিন্দুকে রক্ষা করার জন্য হিন্দুর পাশে দাঁড়াতে হবে। হিন্দুর অধিকার ও সম্মান রক্ষার লড়াইতে নিজেদের শক্তিশালী হতে হবে। সর্বশেষে সকলকে ধন্যবাদ ও বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের মাধ্যমে উপানন্দ ব্রহ্মচারীর পরিচালনায় ও অধ্যাপক হারাধন ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে সভা সম্পন্ন হয়।

জিজিয়া কর না দেওয়ায় শিখের মুণ্ডচ্ছেদ

তিন কোটি টাকার জিজিয়া কর দাবী করে তালিবানরা পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের অরকাজাই এলাকার ছয় শিখ ব্যবসায়ীকে অপহরণ করেছিল।

২১ ফেব্রুয়ারী নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় (৩৪ দিন) পর অপহৃত দুই শিখ যশপাল সিং ও মহাল সিং-এর মাথা কেটে স্থানীয় গুরুদ্বারে পাঠিয়ে দেয় তালিবান বর্বরের দল। সংবাদে প্রকাশ জিজিয়া কর না দিতে পারায়, তাদের ইসলাম কবুল করতে বলা হয়। নির্ভীক যশপাল ও মহাল ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করতেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে মুণ্ডচ্ছেদ করে স্থানীয় 'পেশোয়ার ভাই যোগা সিং গুরুদ্বারে' পাঠিয়ে দেয়। এর পর রবিন সিং নামে এক হিন্দু ইঞ্জিনিয়ারকে অপহরণ করে এক কোটি টাকার মুক্তিপন দাবী করেছে তালিবানরা। পাকিস্তানে মুসলমানদের অত্যাচারে হিন্দু ও শিখের সংখ্যা দিন দিন কমে হয়েছে ২ শতাংশ। ১৯৪৭ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দু-শিখের সংখ্যা ছিল ১৬ শতাংশ। কয়েকটি শিখ সংগঠন এর তীব্র প্রতিবাদ করলেও, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে নি। জোর করে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার ঘটনাও ঘটেছে পাকিস্তানে।

নেপালে হিন্দু রাষ্ট্র প্রবর্তনে আন্দোলন

মাওবাদীরা ক্ষমতাদখলের পরই হিন্দু বিরোধী চক্রান্ত করে একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র নেপালে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন প্রচলন করে। মাওবাদীদের অযোগ্যতা ও প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থতায় নেপালী জনগণ ক্ষুব্ধ। মাওবাদের প্রতি জনগণের মোহভঙ্গের পর নেপালে হিন্দু রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য গণভোটের দাবীতে আন্দোলন শুরু করেছে 'রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টি নেপাল'। কাঠমান্ডু, ললিতপুর ও ভক্তপুর জেলায় ব্যাপক বনধ্ ও ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারী কাঠমান্ডুর সিংহ দরবারের সামনে বিপুল সংখ্যক হিন্দুরা ধর্ণার মাধ্যমে তাদের দাবী-দাওয়া প্রতিধ্বনিত করে। নেপালের হিন্দুদের দাবী মাওবাদী চক্রান্তের মাধ্যমে নেপালে মুসলিম বা খ্রীষ্টান রাষ্ট্র গঠনের চক্রান্ত বাতিল করতে হবে।

পাকিস্তানে পাঠ্যপুস্তকে হিন্দু বিরোধিতা

কানাডার বিখ্যাত পত্রিকা 'টরেন্টো স্টার'-এর সমীক্ষায় পাকিস্তানের পাঠ্যক্রমের মধ্যে অসহিষ্ণুতা আর জেহাদী মানসিকতা তৈরির এক চক্রান্তের কথা জানা গিয়েছে। বলা হচ্ছে, ওই পাঠ্যক্রম সম্বলিত বইগুলি নাকি বাতিল হয়েছিল, কিন্তু অর্থাভাবে নতুন বই না পাওয়াতে, পুরানো মতেই কাফের বিরোধিতার বিষ ঢালা হচ্ছে শিশু মনে।

সংবাদ সমীক্ষকরা একটি ১২ বছর বয়সী মুসলিম ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করে, বলতো—ভারতের ভাল কি কি? উত্তর আসে—ভারতের প্রাকৃতিক খনিজের উৎসগুলি ভালো। ছেলেটিকে আবার প্রশ্ন করা হয়—ভারতের খারাপটা কি? সে উত্তর দেয়—ভারত কাশ্মীর ছিনিয়ে নিয়েছে। ভারত হল পাকিস্তানের শত্রু।

সমীক্ষায় প্রকাশ, পাক পাঞ্জাব সরকারের ষষ্ঠ স্তরের পাঠ্যক্রমে শেখানো হচ্ছে হিন্দুদের পূর্বপুরুষরা জুয়া, মদ্যপান ও নৃত্যগীতের অনুরাগী ছিল....আর হিন্দু ধর্মের ভিত্তিই হল অবিচার ও নির্দয়তা। আর ইসলামের সব কিছুই ভালো আর মহান।

বাগানগ্রামে হিন্দু সংহতি কর্মীদের উপর আক্রমণ

গত ২৫-২-১০ তারিখে বনগাঁ থানার বাগানগ্রামে একটি বৈঠক আয়োজিত হয়। বনগাঁ শহরেরর সংহতি কর্মীরা ওই বৈঠকে যোগ দেয়। বৈঠক চলাকালীন বাগানগ্রাম এলাকার বামপন্থী কর্মী ধনঞ্জয় বিশ্বাস ও মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস হঠাৎ বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের উপর চড়াও হয়। ঘটনায় সংহতি কর্মী সমীর মণ্ডলের মাথা ফেটে যায় এবং বেশ কয়েকজন আহত হন। বনগাঁর সংহতি নেতা অজিত অধিকারীর নেতৃত্বে সংহতি কর্মীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। এলাকার সংহতির কাজকর্ম বৃদ্ধি রুখতে এই আক্রমণ হয়েছে বলে স্থানীয়ভাবে জানানো হয়েছে। পরে বনগাঁ থানায় ঘটনাটি জানিয়ে একটি ডায়েরি করা হয়েছে। (কেস নং—৭১/১০, ধারা ৩৫৫/৩০৮/৩৭)

হিন্দু মেয়ে অপহরণ

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০১০ পূর্ব কলকাতায় জগৎপুর উদ্বাস্তু বাজার থেকে শম্পা মণ্ডল নামে একটি ১৩ বছরের মেয়েকে মুসলিম ছেলেরা অপহরণ করে। মেয়েটির বাবা শ্রী বিজয়কুমার মণ্ডল ঐ দিনই জগৎপুর এলাকায় হিন্দু সংহতি কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে সংহতি কর্মীরা বিজয়বাবুর কাছ থেকে সমস্ত তথ্য জেনে বাগুইহাটি থানায় বিজয়বাবুকে সঙ্গে নিয়ে অপহরণের F.I.R. করে (নং 71/10, Dt.9-2-2010)। মূল অভিযুক্ত মোহম্মদ ভুলো মণ্ডলের বিরুদ্ধে 363/366 IPC ধারায় পুলিশ একটি মামলা রুজু করেছে।

অপহৃতা মেয়েটির বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগণার স্বরূপনগর থানার অন্তর্গত পূবালী গ্রামে। অপরহণকারী মহঃ ভুলো মণ্ডল থাকত মধ্য বারাসতের (শুটিয়া) গ্রামে।

ব্রিটেনে হিন্দুমতে দাহ

খোলা আকাশের নীচে হিন্দু মৃতদেহের সংস্কারের অনুমতি ছিল না এতদিন ব্রিটেনে। ২০০৬ সালে নিউ ক্যাসেলের দেবেন্দ্র ঘাই হিন্দুমতে এক আত্মীয়ের দাহ সংস্কারের চেষ্টায় বাধা পেয়ে আইনের শরণাপন্ন হন। পরিবেশ দূষণ, খ্রীষ্ট্রীয় মত পরিপন্থী ইত্যাদি নানা কারণ দর্শিয়ে দীর্ঘদিন মামলার নিষ্পত্তি হচ্ছিল না। অবশেষে ১১ই ফেব্রুয়ারী ব্রিটেনের সর্বোচ্চ কোর্ট অব আপিল থেকে জয়যুক্ত হয়েছেন দেবেন্দ্র ঘাই। এখন থেকে ব্রিটেনের হিন্দুরা খোলা আকাশের নীচে ঘেরা দেওয়ালের মধ্যে হিন্দু সংস্কারে মৃতদেহ দাহ করতে পারবেন। ব্রিটেনের সংবাদসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে যে, এই মামলার পিছনে বর্তমানে ব্রিটেনে বসবাসকারী ৫,৬০,০০০ হিন্দুর বেশীরভাগেরই সমর্থন ছিল।

হিন্দু সংহতির উদ্যোগে ৩রা মার্চ উত্তর ২৪ পরগণার ধুতুরদহ অঞ্চলে দেবীপুর আদিবাসী গ্রামে বস্ত্রদান কার্যক্রমে বস্ত্রদান করছেন হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ

বসিরহাটে আবার দেববিগ্রহের অপমান

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাট থানার অন্তর্গত পিফা গ্রামের দাস পাড়ায় ১৫০ বছরের পুরানো পূজা কালী ও শীতলা পূজা। ঐ পাড়ায় মাত্র ২২ ঘর হিন্দু বর্তমানে বাস। তারা একটি 'শান্তি কমিটি' করে এবছর ২৬ মাঘ মঙ্গলবার এই পূজার আয়োজন করেছিল। গত ১লা ফাল্গুন, ১৪ ফেব্রুয়ারী রাত্রে কে বা কারা ঐ পূজার কালী প্রতিমার জিভ কেটে নেয়, হাত ভেঙে দেয়, মহাদেবের মূর্তির মাথা কেটে নেয় ও শীতলা ঠাকুরের মূর্তি ফেলে দেয়। শান্তি কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাসের মতে এই ঘটনার জন্য দায়ী কে বা কারা তিনি জানেন না। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ দুইজন ব্যক্তির উপর। একজন রহিম বক্স মোল্লা ও অপরজন রবিউল। কারণ পূজার কয়েকদিন আগেই এরা প্রতিমা ভেঙে দেবার হুমকি দিয়েছিল। তবে এলাকার হিন্দুরা আতঙ্কিত ও ভয়ে মুখ খুলতে চাইছে না।

১৫ ফেব্রুয়ারী সোমবার সকালে ভাঙা প্রতিমা দেখে গ্রামবাসী হিন্দুরা তিন ঘণ্টা ধরে বসিরহাটের আর.এন.মুখার্জী রোড অবরোধ করে। ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে কিন্তু কোন পদক্ষেপ নেয় না। প্রশাসনের একটাই আশ্বাস-'আমরা দেখছি'। মাত্র দুমাস আগে ১৬ ডিসেম্বর এই একই বসিরহাট থানার অন্তর্গত কচুয়া পঞ্চায়েতের কাঁকড়া গ্রামের কালি প্রতিমা পুড়িয়ে দেওয়া ও গহণা চুরির ঘটনাতেও এই থানার পুলিশ এখনও দেখছে। আর এই মহকুমার হিন্দুরা অসহায়ভাবে তাকিয়ে দেখছে তাদের ধর্মের অপমান, মা-বোনের ইজ্জত যাওয়া আর পায়ের নীচের মাটি সরে যাওয়া।

১০ই ফেব্রুয়ারী সোনাখালি শহীদ দিবস ও বস্ত্রদান

নয় বছর পূর্বে ২০০১ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী বাসন্তী থানার ৩নং সোনাখালি গ্রামে মুসলমান আততায়ীর হাতে নিহত চারজন মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদের স্মৃতিতর্পণে এবছর শহীদতীর্থ সোনাখালিতে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে রক্তদান শিবির ও বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। এই চার শহীদ স্বয়ংসেবকের নাম অভিজিৎ সরদার, পতিতপাবণ নস্কর, অনাদি নস্কর ও সুজিত নস্কর।

সুসজ্জিত স্মৃতিবেদীতে মাল্যদান, দীপ প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপানন্দ ব্রহ্মচারী, সুজিত মাইতি, দীনবন্ধু ঘরামী, বিকর্ণ নস্কর সহ শোকার্ত গ্রামবাসী ও সংহতির কর্মীবৃন্দ। সকালে রক্তদান শিবিরে ১ জন মহিলা (শ্রীমতী সোমা হালদার) সহ ৩০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। ২নং সোনাখালি এলাকায় গরীব কিশোরীদের (৯৫ জন) মধ্যে বস্ত্র, চুড়িদার বিতরণ করা হয়।

বিকালে পিচাখালি প্রগতিশীল প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক জনসমাবেশে শহীদদের বলিদানের পরিপ্রেক্ষিতে সোনাখালিতে বর্তমান সময়ে হিন্দু সংগঠনের বাস্তব অবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা হয়। মুখ্য বক্তা ছিলেন উপানন্দ ব্রহ্মচারী।

সংহতিকে সাহায্য করায় মুসলিম দুষ্কৃতিরা হিন্দু দোকান পোড়াল

গত ১৪ ফেব্রুয়ারী সংহতির প্রচারের জন্য ক্যানিং থানার ভোজাটি গ্রামে দেওয়াল লেখাকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী গ্রামের মুসলমান নজরুল গণি, পিতা আমিরুল গণি (সিপিএম-এর লিডার), অনিল দলুইকে ধমক দেয় এবং অন্য একজনকে মারধোর করে। অনিল দলুই এই কথাকে উপেক্ষা করে সংহতির প্রচার করতে থাকে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০৬ (দুইশত ছয়) জনকে নিয়ে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। ফলস্বরূপ নজরুল গাজী তার দলবল নিয়ে ১৬ ফেব্রুয়ারী গভীর রাতে, এই আদিবাসী গ্রামের হিন্দুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই সংগঠনের একনিষ্ঠ কর্মী সুন্দর দলুই-এর দোকানটি বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দেয়। কারণ দোকান মালিক সুন্দর দলুই এই অনুষ্ঠানের টিফিন বাবদ সমস্ত খরচ দেয়। প্রায় ৮০ (আশি) হাজার টাকার মালপত্রের ক্ষতি হয়েছে। সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজিত মাইতি বোমায় পুড়ে যাওয়া ঐ দোকান পরিদর্শন করেন, সুন্দর দলুই ও তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এবং দোকানটি পুনরায় চালু করার জন্য সহযোগিতার ব্যবস্থা করেন।

প্রকাশক, মুদ্রক ও সত্ত্বাধিকারী প্রকাশ চন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন দে

ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮, ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯, ইন্টারনেট ঃ http://hindusamhati.blogspot.com, ই-মেল ঃ prokash.das@rediffmail.com